Sep. 03 2002

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ সংশোধনের এখনই সময়

অন্যদৃষ্টি

মিজানুর রহমান খান

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান দুজনই মনে করেন ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের যে বিধান বিদ্যমান রয়েছে, তার আশু সংশোধন অত্যাবশ্যক। রোববার শ্রদ্ধেয় এই দুই শিক্ষকের সঙ্গে আমার কথা হয় টেলিফোনে। সম্প্রতি শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে গঠিত এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন তার রিপোর্টে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে উঁচু মানসম্পন্ন, দক্ষ ও নিরপেক্ষ শিক্ষককে উপাচার্য নিয়োগ করা যায় সে লক্ষ্যে সকল দল, মত ও পথের অনুসারী শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বশীল একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। তিয়াত্তরের আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে সকল দল ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মতামত নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলেও কমিশন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। বস্তুত এই আদেশ সংশোধনে বহু বছর ধরেই সংশ্লিষ্ট সচেতন মহলে একটা সমঝোতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সংস্কারের আরও দশটি বিষয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দায়িত্বভার গ্রহণ করা নিয়ে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় সংবেদনশীলতা। তবে সম্ভবত এ-ই প্রথম এই দুরূহ বিষয়টিতে একটি বিচার বিভাগীয় অনুমোদন পাওয়া গেল। আমরা বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জুল ইসলামের পর্যবেক্ষণের আলোকে অত্যন্ত জোরালোভাবে বলতে চাই যে, শামসুন্নাহার হলের ঘটনাকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার আগে তাকে যুক্ত করতে হবে শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গেই। সুতরাং বিচার বিভাগীয় কমিশন যথার্থভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ভিসি নিয়োগের বিধিবিধান সংশোধনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে এই কাজে হাত দিতে গিয়ে তিয়াত্তর সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ কোন পটভূমিতে এসেছিল, তা নির্দলীয় ও নির্মোহভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক রুশোর একটি মন্তব্য হচ্ছে: ফেরেশতাদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সেখানে গণতন্ত্র অবশ্যই কার্যকর রূপ পেতে পারত। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ পরাজিত সামরিক স্বৈরাচারের ক্লেদাক্ত অতীতকে পেছনে রেখে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় সিক্ত হবে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ঘটেছিলও তাই। ১৯২০ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের আওতায় সিন্ডিকেটের মনোনীত প্যানেল থেকে ভিসিকে নিয়োগ দিতেন চ্যান্সেলর। কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতলগত করতে একটি কালো আইন প্রণয়ন করেন। এ আইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। ভিসি নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নরের ক্ষমতা করা হয় নিরঙ্কুশ। মোটামুটি বলা চলে, স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করা হয় সরকারের বশংবদে। এই পটভূমিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে ১৯৭৩ সালের আদেশটি জারি করা হয়। শুনেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম ভিসি মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর হাবিবুল্লাহ এবং প্রফেসর খান সারোয়ার মুর্শিদ এই আদেশ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রথম দু'জন বহু পূর্বেই পরলোক গমন করেছেন। আর প্রফেসর মুর্শিদ নাকি মাঝে মধ্যে ওই আইন প্রণয়নের জন্য আক্ষেপ করেন। সত্যাসত্য যাচাই করিনি। তবে তাদের সেই সময়ের সদিচ্ছা এবং তাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্রুত সম্মতিদান ছিল একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এ ক্ষেত্রের যে ব্যর্থতা তাকে যাচাই করে দেখতে হবে রুশোর ওই কালজয়ী উক্তির নিরিখেই। তিয়াত্তরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের বিধানাবলী ফেরেশতারা বাস্তবায়ন করলে আজকের দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার-১৯৭৩-এর ১১ অনুচ্ছেদের প্রথম দফাটি এরকম: *'VC shall be appointed by the Chancellor for a period of 4 years from a panel of 3 persons to be nominated by the senate on such terms and conditions as may be determined by the Chancellor.'* সিনেটের গঠন-প্রণালীর দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করা। সরকারসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক স্নাতকদের প্রতিনিধিত্বমূলক সিনেট বাস্তবে পরিণত হয়েছে দুঃসহ দলীয় রাজনীতির বালাখানায়। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়। যুগপৎ চমকপ্রদ ও ভয়ানক বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, সেই ১৯৭৩ সালের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন ভিসি নিয়োগে সিনেট কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রপতিকে টপকানোর সুযোগই পায়নি। দেখা যাচ্ছে চ্যান্সেলর মনোনীত নতুন ভিসি তার সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি নিজের নাম এক নম্বরে রেখে 'বিধি অনুযায়ী' সিনেটের তিন সদস্যের প্যানেলটি নির্বাচন করে চ্যান্সেলরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সদ্য পদত্যাগকারী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অনেকের মতে, এটা আইনের ফাঁক অথবা প্রথম থেকেই চলে আসা রেওয়াজ। অথচ আইন প্রণেতাদের লক্ষ্য এমন হওয়ার কথা নয়। স্পষ্টতই ভিসি নিয়োগে পরাধীন যুগের চ্যান্সেলরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে খর্ব করতে স্বাধীন বাংলাদেশে

নির্বাচিত ইলেক্টোরাল কলেজ- সিনেটের মাধ্যমে একটা কার্যকর 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপ্রিয় বাস্তবতা হল, উজ্জ্বল ১৯৭৩ ধূসর ১৯৬২-কে অতিক্রম করতে পারেনি। আমরা তো বলতেই পারি, সিনেটের কাছ থেকে তিন সদস্যের প্যানেল না পেয়েই চ্যান্সেলররা ভিসি নিয়োগে যে ক্ষমতার অনুশীলন করে চলেছেন, তার বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভিসিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে। ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের ঘোষণা হচ্ছে, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রিন্সিপ্যাল এক্সিকিউটিভ ও অ্যাকাডেমিক অফিসার'। তিনি এমনকি সিনেট, সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন পর্যায়ের বৈঠকে তিনি যে কোন মুহূর্তে বক্তৃতা দান করার অধিকারী। সুতরাং ভিসি ক্ষমতাসীন সরকারের আশীর্বাদ নিয়ে নিয়োগ লাভের পর তারই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেট সভায় যে প্যানেলটি তৈরি করা হবে, তাতে তিনি যে তার অনুকূলে প্রভাব খাটাতে সক্ষম হবেন তাতে আর সন্দেহ কী। এ কথার উল্লেখ আজ কেবল দুর্ভাগ্যজনকই নয়, নিদারুণ পরিহাসেরও যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আজও সোনার হরিণ। বলা যায়, এটা আছে কেবলই কাগজে-কলমে। ভিসি নিয়োগে ইতিহাসের কোন কোন পর্বে এমন কিছু ঘটে থাকবে, যাতে হয়তো আইয়ুব-মোনায়েম খাঁর প্রেতাত্মাও লজ্জা পাবে! এরকম একটি পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। আশা করব, তারই সিদ্ধান্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের ভিসি নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ তিনি গ্রহণ করবেন। পরিবর্তিত নতুন পদ্ধতিটি কি হবে, তা নিয়ে মতভেদ থাকটাই স্বাভাবিক। যেমন- প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মনে করেন, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কাউকে ভিসি নিয়োগ করা হলে দলীয় রাজনীতি বা কোটারি স্বার্থের অক্টোপাস থেকে অনেকখানি পরিত্রাণ মিলতে পারে। এটা তো ঠিক যে, কোন অধ্যাপক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫/৩০ বছর কাটানোর ফলে সেখানে তার যে লিগেসি তৈরি হয়, অন্যরা তা থেকে মুক্ত থাকবে। সাদা বা নীল কোন রঙই তাকে সেভাবে স্পর্শ করবে না। ১৯৭৩ সালের আইন দেশের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বলবৎ করা হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপাচার্যের পদটি এখন যেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যই সংরক্ষিত হয়ে গেছে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিংবা ফজলুল হালিম চৌধুরী, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক ছিলেন, তাদের মতো আর কি কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারবেন? অথ[illegible] দু'জনেই ছিলেন দারুণ সফল এবং জনপ্রিয়। প্রতিবেশী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু এযাবৎ এটাই অনুসরণ করে আসছেন যে, তারা বাইরের শিক্ষাবিদকে ভিসি করে আনেন। আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ উন্নত দেশে ভিসি নিয়োগে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিয়ম। খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। মেধাবী ও যোগ্যতমদের জন্য সব দরজাই খোলা। ব্রিটিশ প্রফেসর সি ডানকান রাইসের কথাই ধরা যাক। তার জন্ম অ্যাবারডিনে। ইউনিভার্সিটি অব অ্যাবারডিন (*Aberdeen*) ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে তিনি ইতিহাসে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। অধ্যাপনারও হাতেখড়ি এখানেই। কিন্তু নব্বই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা তহবিল বৃদ্ধির জন্য যে ব্যাপক প্রচারণা চলে, তিনি তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। এ সময় (১৯৯১-৯৬) তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ভিসি। '৯৬-এর সেপ্টেম্বরে ইতিহাসবিদ মি. রাইসকে অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্সিপাল ও ভিসি নিয়োগ করা হয়। সেই থেকে তিনি এ দায়িত্বে রয়েছেন। প্রফেসর রাইসকে ভিসি হিসাবে মান্য করতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারও অসুবিধা হয়নি। প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান এ ক্ষেত্রে একটি এদেশীয় বিপদের কথা বলেছেন। 'অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে সহজে ভিসি হিসাবে মানতে চাইবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।' তাই তার মত হচ্ছে, উন্নত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ভিসি নিয়োগে চ্যান্সেলর কর্তৃক সার্চ কমিটি গঠনের। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যোগ্যতম ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের প্রশ্নে অপর এক শিক্ষাবিদের অভিমত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভিসি নিয়োগ করা যেতে পারে। এর জন্য পাঁচ কিংবা সাতজনের একটি প্যানেল থাকবে। এই দায়িত্ব দেয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ওপর। কমিশন প্যানেল তৈরি করে চ্যান্সেলরের কাছে দেবেন এবং তিনি প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের মধ্য থেকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করবেন।

তবে আসল কথা হল, এ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সমঝোতা দরকার। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো দরকার। ভিসির পদ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন, পিএসসি, ইউজেসি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'আমাদের লোক' বাছাইয়ের সংস্কৃতি বন্ধ হোক। তবে এ তো আর সহজে হবে না। তাই লাগসই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব বদলে দেয়া উচিত। আমার মনে হয়, বাইরের কাউকে ভিসি করা হলে দলীয় ফ্যাক্টর বেশ হ্রাস পাবে। বিচার বিভাগীয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে আওয়ামী লীগের উচিত হবে এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেয়া। একটি তথ্যের অবতারণা এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করছি। তিয়াত্তরের আদেশ জারির বছর না ঘুরতেই বঙ্গবন্ধু ক্রমবর্ধমান 'শিক্ষক রাজনীতি'র চেহারা দেখে খুবই বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন। সময়টা হয়তো হবে ১৯৭৪ সালের শেষাশেষি। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান এ বছরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। ভিসির দায়িত্বে আবদুল মতিন চৌধুরী। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের চিফ সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার ছিলেন। তিয়াত্তরে তিনি দেশে ফিরলে তাকে ভিসি নিয়োগ করা হয়। জনাব চৌধুরী একদিন প্রফেসর তালুকদারকে ডেকে একান্তে বললেন, বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা দেখে বেশ বিচলিত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ সংশোধনে তার প্রবল ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। ২৮ বছর পর এই তথ্য প্রকাশ করে তালুকদার স্যার বললেন, 'মুজিব এটা ভেবেছিলেন এটাই তাৎপর্যপূর্ণ।' আশা করব, বর্তমান সরকার তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে অকারণে কটাক্ষ না করে দেশ ও জাতির স্বার্থে যথাসময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপটি নিতে সক্ষম হবে। [illegible] পথ খুলে দিয়েছেন।